72

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 APR 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

গণসাক্ষরতার একটি বিকল্প উপায়

আহমদ শরীফ

আমাদের দেশে মুসলিম সমাজে বিগত অন্তত ছয়-সাত বছর ধরে একটা শিক্ষারীতি চালু রয়েছে। সে-রীতিকে বলে 'নাজিরি' পাঠরীতি। অর্থাৎ চোখে দেখে কেবল আরবী হরফ চিনে 'মতন' বা কুরআন পাঠ করা শেখা ও শেখানো এদের আরবী হরফ লেখানো হয় না এবং আরবী ভাষাও শব্দার্থ বা বাক্যার্থসহ পড়ানো হয় না। কেবল হরফ চিনে নিয়ে প্রশিক্ষকের সাহায্যে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াত শেখাই এদের লক্ষ্য। এ প্রথা আজো শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে গাঁয়ে-গঞ্জে। শহরে-বন্দরে চালু রয়েছে। আরবী ভাষা না-জেনে, না-বুঝেও কেবল চোখে দেখে মুখে শব্দ উচ্চারণেই সওয়াব বা পুণ্য মেলে-এই হচ্ছে এদের ধারণা। তা ছাড়া সুরার বা আয়তের অর্থ না বুঝেও নামাজ পড়ার জন্যে জানাজা পড়ার জন্যে, কবর-মাজার-দরগাহ জিয়ারতের জন্যে কুরআনের সুরা, আয়াত ও দোয়া-মুনাজাত মুখে উচ্চারণ আবশ্যিক।

আরবী ভাষায় স্বরবর্ণ নেই। অ-আরবের সুবিধের জন্যেই আবর সাম্রাজ্যেও অ-আরব মুসলিম সমাজে আরবী উচ্চারণ নির্দেশের জন্যেই জের, জবর, পেস্, জজম প্রভৃতি স্বর-প্রতীক চিহ্ন উদ্ভাবিত ও প্রযুক্ত হয়েছে ইসলামের উন্মেষ ও রাজ্য বিস্তার যুগে।

আমাদের বাংলা হরফ ব্রাহ্মীলিপিরই বিবর্তিত রূপ। এবং বর্ণমালা হচ্ছে ধ্বনি প্রতীক। কেবল ব্যতিক্রম আছে একটা যুক্তবর্ণে জ+ঞ-জ্ঞ হয়।

আমরা জানি, জিহ্বার আড়ষ্টতার কারণে, শারীরিক অসুস্থতার দরুন, আবহাওয়ার প্রভাবের ফলে, অন্য প্রতিবেশী ভাষার সাদৃশ্যে, দাঁত থাকা না-থাকার কারণে সর্বোপরি আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার দরুণ বর্ণমালা ও ভাষা অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একই ভাষা প্রজন্মক্রমে এমনকি ব্যক্তিভেদে বিকৃত বা বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন, বিচিত্র ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। যেমন মালদহ, রংপুর, সিলেট, নোয়াখালী, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় উচ্চারণ বিকৃতিজাত যে পার্থক্য ঘটেছে, লিখিত উড়িয়া অসমী-বাংলা ভাষাও সে পার্থক্য দুর্লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের লেখ্য বাংলার রূপ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আঞ্চলিক উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য ঘটেই। তাতে তেমন কিছু অসুবিধে হয় না, কথা বুঝে নিতে।

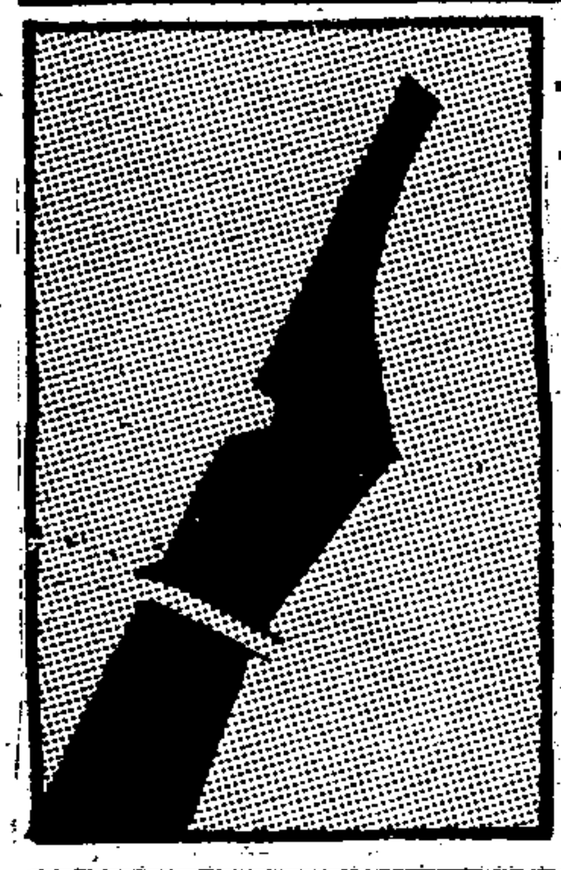

সরকার কিংবা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা কোন গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এ পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্যতা বা ফলপ্রসূতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এতে যে কোন প্রাথমিক বিদ্যাসম্পন্ন লোককে নিয়োগ করা সম্ভব বলেই স্বল্প অর্থ ব্যয়ে এক পক্ষের কিংবা এক মাসের সময় পরিসরে কি ফল পাওয়া যাবে তা-ও পরীক্ষণ-সমীক্ষণ করা সম্ভব হবে।

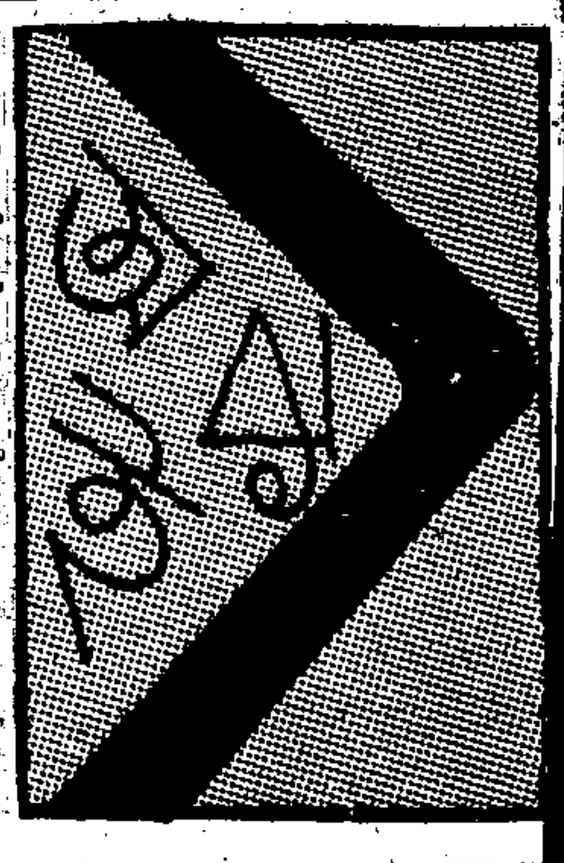

কিন্তু গণশিক্ষার জন্যে আমাদের বাংলা বর্ণমালার উপযোগ অসামান্য কেন না, আমরা ওই আরবীর মতোই বাংলা বর্ণমালা লেখানোর চেষ্টা না করে কেবল 'নাজিরি' পদ্ধতিতে বর্ণমালা সেখানোর চেষ্টা করলে বয়স্ক [কিশোর থেকে পঞ্চাশ বছরের পৌঢ় অবধি সবাই] লোকেরা নিজেরাই মাতৃভাষা সহজে শিখে-বুজে-জেনে নেবে। যেমন ক+ল+ম=কলম, এ+ক=এক, অবশ্য যুক্তাক্ষর আপাতদৃষ্টিতে জটিল ও শেখানো কঠিন বলে মনে হতে পারে বটে তবে ষ+ক=ক্ষ, ম+উ+ক+৩=মুক্ত-এভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে শেখালে-বোঝালে বয়স্ক লোক নিজের বুদ্ধি প্রয়োগেই [যেহেতু ভাষা তার জানা] তার আঞ্চলিক উচ্চারণে তা আয়ত্ত করতে পারবে।

আর এ প্রস্তাব নিতান্ত বাতুলের মানসপ্রসূন বলে অগ্রাহ্য না করে একে গুরুত্ব দিলে সাক্ষর কৌতূহলী ব্যক্তি নিজে নিজেই বর্ণ লেখায় আগ্রহী হবে। এ জন্যে দরকার কেবল স্বরবর্ণের ওকারের এবং ব্যঞ্জন বর্ণের ওফলার আর কয়েকটি দুই, তিন। চার বর্ণের যুক্তাক্ষর গঠন পদ্ধতির নমুনাসমেত একটি বর্ণমালার বই। যেহেতু শিক্ষার্থীরা শিশু নয়, সে জন্যে বাক্যের নমুনা দেয়া বা পাঠদানের ব্যবস্থা রাখা হবে বাহুল্য মাত্র।

আমাদের ধারণা চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণী অবধি পড়েছে তেমন সাক্ষর প্রশিক্ষক তথা সাহায্যকারী দিয়েই একপক্ষকালের মধ্যেই আগ্রহী নিষ্ঠ বয়স্ক শিক্ষার্থীদের পত্রিকা পাঠ করার মতো বর্ণ জ্ঞানদান সম্ভব। কেননা তারা রাজনীতিকদের চলতি ভাষায় দেয়া ভাষণ-বক্তৃতা বোঝে, অর্থাৎ তাদের শুদ্ধ বাক্যবোধ রয়েইছে।

সরকার কিংবা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা কোন গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এ পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্যতা বা ফলপ্রসূতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এতে যে কোন প্রাথমিক বিদ্যাসম্পন্ন লোককে নিয়োগ করা সম্ভব বলেই স্বল্প অর্থ ব্যয়ে এক পক্ষের কিংবা এক মাসের সময় পরিসরে কি ফল পাওয়া যাবে তা-ও পরীক্ষণ-সমীক্ষণ করা সম্ভব হবে।

আহমদ শরীফঃ প্রাবন্ধিক গবেষক, কলাম লেখক, বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।